সেচ সঙ্কটে বরেন্দ্রভূমি

এবনে গোলাম সামাদ

প্রাচীনকালে এদেশের রাজারা রাজ্য শাসন করার জন্য তাদের রাজত্বকে কতগুলো ভাগে বিভক্ত করতেন। সবচেয়ে বড় ভাগকে বলা হতো ভুক্তি। প্রতিটি ভুক্তিকে ভাগ করা হতো কতগুলো বিষয়ে। বিষয়কে ভাগ করা হতো কতগুলো মণ্ডলে। মণ্ডলকে কতগুলো বীথি ও বীথিকে ভাগ করা হতো গ্রামে। প্রাচীনযুগে বরেন্দ্র বলতে একটি বিশেষ মণ্ডলকে বোঝাতো। এই মণ্ডলের পশ্চিমে হলো মহানন্দা নদী। পূর্বে হলো করতোয়া নদী। আর দক্ষিণে পদ্মা। এরকমই মনে করেন ঐতিহাসিকরা। বরেন্দ্র নামটি নতুন করে ব্যবহৃত হতে থাকে বাংলাদেশ হওয়ার পরে। কতকটা বর্তমান রাজশাহী বিভাগকে বোঝাতে। বরেন্দ্র অঞ্চলের একটি অংশকে চলতি কথায় বলা হয় ?বরিন্দ?| বাংলাদেশে যার ক্ষেত্রফল হলো তিন হাজার ছয়শ? বর্গমাইল। ভারতেও ?বরিন্দ? আছে। বরিন্দ হলো উঁচু ভূমি। শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে এসে থাকতে পারে। ফারসি ভাষায় বরিন্দ মানে উঁচু ভূমি। বরিন্দ হলো চারপাশের জমি হতে ৪০ থেকে ৬০ ফুটের মতো উঁচু। আগে সম্ভবত আরও উঁচু ছিল। এর মাটি হলো লাল অথবা লালচে হলুদ, যা দেখে এর পার্শ্ববর্তী অন্য জায়গার মাটি থেকে সহজেই চেনা যায় পৃথক করে। এখানকার জনবসতির ঘনত্ব হলো বাংলাদেশের অনেক জায়গার তুলনায় বেশ কম। এই কম হওয়ার একটি কারণ হলো, আগে এখানে আমন ধান ছাড়া কিছু হতো না। জমি ছিল বিশেষভাবেই একফসলি। তাছাড়া এখানকার আবহাওয়া হলো রুক্ষ প্রকৃতির। বাংলাদেশের অন্য জায়গার তুলনায় এখানে গরম পড়ে বেশি। এ অঞ্চলের ইতিহাস অনুসরণ করলে মনে হয় এখানে একসময় ছিল বড় বড় গাছ। কিন্তু পরে যে কারণেই হোক, এই স্থান হয়ে পড়ে বৃক্ষশূন্য। বরেন্দ্র সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল প্রধানত এখানে সেচের পানি সরবরাহ করে বোরো মৌসুমে ধান আবাদ করার লক্ষ্যে। সেচের পানির জন্য এখানে বসানো হয় বিদ্যুৎচালিত গভীর নলকূপ। যার ফলে ভূগর্ভস্থ পানি (g r o u n d wa t e r) ব্যবহার করে এখানে সম্ভব হতে পারে ধানের আবাদ বৃদ্ধি। কিন্তু এখন গভীর নলকূপের সাহায্যে পানি ওঠানোর ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বহু নিচে নেমে গেছে। আর তাই বেশকিছু জায়গায় আর সম্ভব হচ্ছে না গভীর নলকূপের সাহায্যে পানি উত্তোলন। মাটির নিচে যে পানি পাওয়া যায়, তার উৎস প্রধানত বৃষ্টির পানি। বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি মাটির মধ্য দিয়ে চুঁইয়ে নিচে গিয়ে জমা হয়। সৃষ্টি হতে পারে ভূগর্ভস্থ পানি স্তর (wa t e r t a b l e)|

প্রতি বছর বৃষ্টির পানি যে হারে জমা হয়, তার চাইতে গভীর নলকূপের সাহায্যে পানি বেশি তুলে নিলে সৃষ্টি হয় ভূগর্ভস্থ পানির অভাব। বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির অভাব সৃষ্টি হতে পেরেছে এইভাবে। ভূগর্ভস্থ পানির অভাবে এখন সাধারণ কুয়া এবং নলকূপে পানি পাওয়া যাচ্ছে না। ভূগর্ভস্থ পানি অধিক মাত্রায় তুলে নেওয়ার জন্য শুকিয়ে যাচ্ছে খাল-বিল। আর তার ফলে দেখা যাচ্ছে মাছের অভাব। সেটাও হয়ে উঠছে একটি বড় রকমের সমস্যা। বরেন্দ্র অঞ্চলে বৃক্ষ প্রায় ছিল না। গভীর নলকূপ থেকে পানির সাহায্যে নেয়া হয় বনায়নের উদ্যোগ। এর ফলে হতে পেরেছে কিছু কিছু বৃক্ষ। আগের তুলনায় বরিন্দকে দেখাচ্ছে অনেক সবুজ। কিন্তু বৃক্ষ মাটি থেকে অনেক পানি গ্রহণ করে। বৃক্ষের কারণে মাটিতে হতে পারে পানির অভাব। বনে বৃষ্টি হলে বৃষ্টির পানি অনেক পরিমাণে আটকে যায় গাছের পাতায়। তা মাটিতে পড়ে চুঁইয়ে গিয়ে ভূগর্ভস্থ পানির মাত্রা বাড়াতে পারে না। বৃক্ষরোপণ তাই বরেন্দ্র অঞ্চলে সেচের পানির অভাব ঘটাতেই পারে। বরেন্দ্র অঞ্চলে, বিশেষ করে বরিন্দতে আছে অনেক ছোট ছোট নদী। স্থানীয় ভাষায় এদের বলা হয় খাঁড়ি। খাঁড়িগুলো বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানিতে ভরে যায়; কিন্তু শীতকালে যায় শুকিয়ে। অনেকে তাই বলেছেন খাঁড়িগুলোতে উপযুক্ত জায়গায় দেয়াল তুলে বর্ষার পানি (surface water) ধরে রেখে পরে তা সেচের কাজে ব্যবহার করার জন্য। এভাবে বরেন্দ্রর পানির অভাব বেশকিছুটা মেটানো যেতে পারে। এরা বলছেন ভূগর্ভস্থ এবং ভূউপরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবহারের কথা। বরিন্দে সেচের পানির অভাবের জন্য এ বছর বলা হচ্ছে বোরো ধানের আবাদ কম করতে। বলা হচ্ছে অনেক জায়গায় গমের আবাদ বাড়াতে। কারণ গমে ধানের তুলনায় সেচের পানি লাগে অনেক কম। কিন্তু বরিন্দে এখন প্রচুর গোলআলুর চাষ হয়, যাতে লাগে যথেষ্ট সেচের পানি। গোলআলু এখানে হয়ে উঠেছে একটি উল্লেখযোগ্য ফসল, যা কেবল এই অঞ্চলের মানুষের জন্যই নয়। হতে পারছে গোটা বাংলাদেশের মানুষের অন্যতম খাদ্য উৎস। বরিন্দ অঞ্চল হয়ে উঠেছে কার্যত গোটা বাংলাদেশের খামারবাড়ি।

জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে আমরা এখন অনেক কিছুই শুনছি। বলা হচ্ছে, বিশ্বে তাপমাত্রা যে হারে বাড়ছে তাকে যদি রোধ করা না যায়, তাহলে হিমালয় পর্বতমালার সব বরফ গলে যাবে। এখন যেসব নদী হিমালয়ের বরফগলা পানি বহন করছে, ভবিষ্যতে আর তা করবে না। কেবলই বহন করবে বৃষ্টির পানি। এসব নদী শীতকালে হয়ে পড়বে অত্যন্ত শীর্ণকায়। যেমন হয়ে পড়ে দক্ষিণ ভারতের নদীগুলো। হিমালয়ে বরফ না থাকলে গোটা দক্ষিণ এশিয়ার উত্তরভাগে দেখা দেবে ভয়াবহ পানি সঙ্কট। তবে এরকম কিছু বাস্তবে সত্যিই ঘটতে যাচ্ছে কি-না, এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

আমাদের প্রধান খাদ্যফসল হলো ধান। আমরা বাড়াতে চাচ্ছি ধানের উৎপাদন। ধান নিয়ে আমাদের দেশে অনেক গবেষণা হচ্ছে। অল্প পানিতে বর্ধিত হতে পারে এরকম জাতের ধান উদ্ভাবন অসম্ভব নয়। ধান মূলত উষ্ণ অঞ্চলের জলাভূমির ফসল। কিন্তু ধান অনেক পরিবেশেই উৎপন্ন হতে পারে। ধানের জাত বাছাই করে এবং সঙ্কর ঘটিয়ে তাই অল্প পানিতে উৎপন্ন হতে পারে এমন জাতের ধানের উদ্ভব করা সম্ভব। জলবায়ুর পরিবর্তনের কথা বলে একদল বিশেষজ্ঞ মানুষের মনে জাগাতে চাচ্ছেন বিশেষ ভীতি। যেটা ঠিক হচ্ছে না। কারণ পরিবেশের উপযোগী উদ্ভিদ প্রজনন সম্ভব। আর তার মাধ্যমে রক্ষা করা যেতে পারে কৃষিকে। অনেক খাদ্যশস্য আছে, যেগুলো যথেষ্ট কম পানিতে উৎপন্ন হয়। যেমন জোয়ার (দেও ধান), বাজরা, চিনা, মারুয়া প্রভৃতি। এসব ফসল আবাদ করেও আমরা পরিবর্তিত ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করতে পারি। এসব খাদ্যশস্য আহারে আমরা অভ্যস্ত নই। কিন্তু অনেক অঞ্চলের মানুষ এসব খেয়েই বাঁচে। এসব শুষ্ক অঞ্চলের ফসল। পরিবেশের চাপে প্রয়োজনে বদলাতে হবে আমাদের খাদ্যাভ্যাস। বলা হচ্ছে, পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে মেরুমণ্ডলের বরফ গলে সমুদ্রের পানির পরিমাণ বাড়বে। যার ফলে নাকি বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ডুবে যেতে পারে। তবে ঠিক কতটা ডুবতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা আমাদের এখনও সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে পারছেন না। সমুদ্রের পানি বাড়লে কেবল যে বাংলাদেশের মাটিই পানিতে ডুববে এমন মনে হয় না। অনেক দেশের জমি সমুদ্রের পানিতে জলমগ্ন হবে। এটা হতে যাচ্ছে একটা বিশ্বজোড়া বিরাট সমস্যা। তবে বরেন্দ্রভূমি বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলের তুলনায় উঁচু। এই জমি সহজে ডুববে বলে মনে হয় না।

আমরা দেখেছি বরেন্দ্রর সেচ সঙ্কট কীভাবে সৃষ্টি হতে পেরেছে। এর সঙ্গে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের কোনো সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশের অনেক আগে ভারতের অনেক জায়গায় গভীর নলকূপ স্থাপন করে সেচব্যবস্থা শুরু হয়। কিন্তু সে দেশেও একইভাবে দেখা দিয়েছিল সেচের পানির সমস্যা। আমরা যদি জানতাম ভারতের এই সমস্যার কথা, তাহলে আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো বরেন্দ্র অঞ্চলে গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সেচ পরিকল্পনায় অনেক সাবধান হতে। কিন্তু সেচব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অভাবে আমরা এই সাবধানতা অবলম্বন করতে পারিনি। কোপেনহেগেনে সবে মাত্র শেষ হয়েছে জলবায়ু সঙ্কট নিয়ে বিরাট এক সম্মেলন। কিন্তু এই সম্মেলন কোনো বাস্তব সমাধান দিতে পারেনি বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির সম্পর্কে। বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি ঠিক কী কারণে ঘটছে, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা এখনও একমত নন। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির ফলে এটা ঘটতে পারছে। কিন্তু বিশ্বে এর আগেও অনেকবার

তাপ বৃদ্ধি ঘটেছে। আর গলেছে মেরুমণ্ডলের বরফ। বিশ্বজুড়ে এখন চলছে বাণিজ্যমন্দা। উন্নত দেশে দেউলিয়া হচ্ছে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি। বাড়ছে বেকার সমস্যা। ফ্রান্সে একটি রাজনৈতিক সংগঠন সম্প্রতি ঘোষণা করেছে, বিশ্বের অর্থনৈতিক সঙ্কট যত ঘনীভূত হবে, তার দিক থেকে দৃষ্টি সরানোর জন্য বলা হতে পারে জলবায়ু নিয়ে সৃষ্ট সঙ্কটের কথা। জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা হয়ে উঠতে পারে বিশেষ ধরনের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যা বলা হচ্ছে, তার অনেকটাই হলো মনগড়া আর বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমাদের দেশে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনীতিবিদরাও তাদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য জলবায়ুর পরিবর্তনকে করতে পারেন দায়ী।

(সুত্র, আমার দেশ, ২৩/১২/২০০৯)